উচ্চশিক্ষা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সংখ্যা নয়, মানহীনতা

শরীফুজ্জামান

প্রকাশ: ০১ জুন ২০২৬ | ১৪:১৮ | আপডেট: ০১ জুন ২০২৬ | ১৪:৫৭

‘গ্রাম-গঞ্জে যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়েছে, তাতে কিছুদিন পর বাড়ি বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে’– এরকম একটি রসিকতা আজকাল বাংলাদেশের পথেঘাটে প্রায়ই শোনা যায়। এই রসিকতার সারবত্তা হলো গত তিন দশকে দেশের নানা প্রান্তে গড়ে ওঠা অন্তত ৩০-৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় আসলে নামেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এদের মাধ্যমে লাখো অযোগ্য শিক্ষার্থীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ তুলে দিয়ে আমরা বেকার তৈরির কারখানা গড়ছি; উচ্চশিক্ষার অবমূল্যায়ন করছি।

প্রসঙ্গত বলি, এ দেশে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও নির্মাণাধীন মোট ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

রয়েছে। ১৮ কোটি মানুষের দেশে এই সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত তো নয়ই, বরং অপর্যাপ্ত। উন্নত বিশ্ব ছেড়ে দিন, দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলেই এই চিত্র পরিষ্কার ধরা পড়ে। যেমন ভারতে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মানুষের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩৪ টি। অর্থাৎ প্রতি কোটিতে ৪.৫। এ সংখ্যা পাকিস্তানে ২২ কোটিতে ১৬০টি। অর্থাৎ প্রতি কোটিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৭.২। নেপালে ৩ কোটির জন্য ২২টি অর্থাৎ ৭.৩। শ্রীলঙ্কায় ২ কোটি মানুষের জন্য আছে ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ ৮.৫। বিপরীতে বাংলাদেশে ১৮ কোটি জনসংখ্যার দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫৫টি। এতে আনুপাতিক হার কোটিতে ৩.০ (তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ওয়েবসাইট)। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হার বাংলাদেশে সবচেয়ে কম।

এর বাইরে ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চালিত আইআইটি, আইআইএম-এর মতো অন্তত আরও ১২৪টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে- যারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়। এসব 'ডিমড ইউনিভার্সিটি'কে আমলে নিলে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপাত বেড়ে ৫.৪ হবে। অর্থাৎ এখানে প্রকৃত সমস্যা সংখ্যা নয়, মানহীনতা এবং এ সমস্যা এতটাই সর্বগ্রাসী ও সর্বজনীন যে তা গত ১০৫ বছরে প্রতিষ্ঠিত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। কেউ যদি কিউএস র‍্যাঙ্কিং ঘাটেন, সাইটেশন স্কোর তুলনা করেন কিংবা ছাত্রদের ক্যারিয়ার গ্রোথ আমলে নেন তবে খেয়াল করবেন এ দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা একই; সামান্য তারতম্য বাদ দিলে সব ক্যাম্পাসেই গবেষণার ঘাটতি, অবকাঠামোর তথৈবচ অবস্থা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, অকার্যকর ল্যাব ফ্যাসিলিটি এবং শিক্ষার্থীদের হাহাকার চোখে পড়বে। অপ্রিয় সত্যটি হলো, ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকাকালে এ দেশে উচ্চশিক্ষার যে হাল ছিল ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান কমায়নি, নতুন করে অযোগ্যদের সনদ বিতরণ শুরু করেনি; তারা শুধু প্রচলিত প্রথাকে অনুসরণ করেছে।

তার মানে এই নয়, বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো কাজ হয় না। এ দেশের গবেষকরা শস্যের নতুন জাত আবিষ্কার করেছেন, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহারে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন, লোয়ার অরবিটে স্যাটেলাইট

বসিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে নিজ উদ্যোগে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ভালো অনেক কিছুই করেছেন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেয়েছেন; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা বা গবেষণায় আমাদের নজর নেই।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১০ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিন; একই সময়ে ভারতের ২৩টি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটই বরাদ্দ পেয়েছে এর চেয়ে বেশি টাকা। এই তুলনা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে আমরা কতটা উদাসীন।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, চেয়ার-টেবিল, মানসম্মত ওয়াশরুম নেই। ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে হেডফোন নেই, কেমিক্যাল ল্যাবে ভালো ভেন্টিলেশন সিস্টেম নেই, বায়োল্যাবে কার্যকরী ইলেক্ট্রোলাইট অ্যানালাইজার নেই... কোনো কোনো গবেষণাগারে পিএইচ মিটার পর্যন্ত নেই। এর বাইরে হলগুলোয় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্ররা দিন কাটায় তা বর্ণনার বাইরে। সরকারি টাকায় তাদের মানসম্মত খাবার যেমন দেওয়া যায় না, তেমনি চারজনের রুমে আটজনকে থাকতে হয় দম চেপে। নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কোনো বালাই যেমন এ দেশে নেই, তেমনি হঠাৎ অসুস্থ হলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যসেবা দেবে এমন কার্যকরী মেডিকেল সেন্টারও নেই।

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের সুবাদে দেখেছি, একই ক্লাসরুম একাধিক বিভাগ শেয়ার করার ফলে কোনো কোনো ব্যাচকে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দেখেছি কীভাবে এক কক্ষে বসে থাকা তিনজন সহযোগী অধ্যাপক (যারা ৪র্থ গ্রেড তথা জেলা প্রশাসকের চেয়ে উঁচু পর্যায়ে চাকরি করেন) নিজের কাগজপত্র রাখার জায়গা পর্যন্ত পান না। আরেকটি কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনীয় সব দেশের চেয়ে এ দেশের শিক্ষকরা কম বেতন পান। প্রতিবেশী দেশগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে যে বেতন দেওয়া হয় আমাদের দেশে দেওয়া হয় তার অর্ধেক। মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য সূচক আমলে নিলে কখনও তা এক-তৃতীয়াংশ! বাংলাদেশের একজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক চল্লিশ বছর শিক্ষকতা ও গবেষণা করার পর মাসে যে বেতন তোলেন তা মার্কিন ডলারে চার অঙ্ক পার করবে না; কিন্তু একই কাজের জন্য ভারত কিংবা

পাকিস্তানে দেওয়া হয় ৩ থেকে ৪ হাজার ডলার! স্বভাবতই মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমে পাড়ি জমান, যেখানে তাঁর শ্রমের মূল্যায়ন অনেক বেশি।

এ ছাড়া গবেষণা করার জন্য পুরস্কারের বদলে বাংলাদেশে রীতিমতো শাস্তি দেওয়া হয়। একজন প্রভাষক যিনি কিনা ৩০০ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বেতন পান, তাঁকে স্বনামধন্য জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ ছাপানোর জন্য ৫০০ ডলার নজরানা দিতে হয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পেশাগত এবং গঠনমূলক কাজের জন্য মানুষকে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয় বলে শোনা যায় না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বাংলাদেশ অবকাঠামোগত নানা মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের সময় পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের তুলনায় দুই-তিন গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করে। দুর্নীতি আর অপচয় মিলিয়ে খরচ হয় হাজার হাজার কোটি কিন্তু শিক্ষায় বরাদ্দ দেওয়ার বেলায় বলা হয় ভাঁড়ে মা ভবানী!
এসবের মূলে রয়েছে একটিই কারণ, আর তা হলো শিক্ষার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম উদাসীনতা। যেখানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা ও গবেষণায় জিডিপির ৫-৬ শতাংশ ব্যয় করতে বলা হচ্ছে। যে যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলো জিডিপির অন্তত ৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে, সেখানে আমরা আজও পড়ে আছি ১.৫%-এর গণ্ডিতে। যুগ যুগ ধরে শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব না দেওয়ার এই প্রবণতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কংক্রিটের মমিতে পরিণত করেছে। এখানে না আছে পড়াশোনার পরিবেশ, না আছে পেশাদার, উদ্যোক্তা বা গবেষক তৈরির পরিবেশ।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, নিয়োগ বাণিজ্য ও আর্থিক দুর্নীতিকে বাংলাদেশে এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁচটিতে নামিয়ে আনলেও শিক্ষা খাতে কোনো উন্নতি হবে না। আমাদের সংখ্যাগত নয়, গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ছোট্ট এই ভূখণ্ডের জনসংখ্যা আগামী দশ বছরে ২০ কোটির সীমা অতিক্রম করবে এবং সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর সিংহ ভাগই হবে বয়সে তরুণ। এদের দেশের বোঝা বানানোর বদলে জনসম্পদে পরিণত করতে চাইলে আধুনিক ও গবেষণামুখী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। তাই আগামী দিনে এ দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছে গেলেও ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নেই, বরং তা হবে আশাব্যঞ্জক। যেহেতু আমাদের দেশে প্রতি জেলায় গড়ে ৩০ লাখ মানুষ বাস করেন, যা কিনা অনেক ইউরোপীয় দেশের মোট জনসংখ্যার সমান, সেহেতু প্রতি জেলায় এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এসব প্রতিষ্ঠান যেন সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আচরণ করে, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন যেন জ্ঞানকেন্দ্রের মতো হয়।

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন একটি স্বাধীন, যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা কমিশন; যার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির নকশা আঁকা হবে। প্রয়োজন শিক্ষা খাতে জিডিপির ন্যূনতম ৩ শতাংশ বরাদ্দ, প্রয়োজন বিদ্যমান সব প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক চাহিদা পূরণ। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

ছাত্রদের শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পিএসসির মতো বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছ নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগ, মৌলিক অবকাঠামো ও সবুজ ক্যাম্পাস তৈরিকল্পে অন্তত ১০০ একর ভূমি বরাদ্দ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করতে হবে। থাকতে হবে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ও সিনেট, থাকতে হবে সুস্থ বিনোদন এবং খেলাধুলার সুযোগ। শিক্ষক ও ছাত্ররা যদি রাজনৈতিক চর্চা করতে চান তবে বিগত চার দশকের ধ্বংসাত্মক অপরাজনীতি বাদ দিয়ে সেই প্রক্রিয়াকে প্রগতিশীল, মানবিক ও জবাবদিহিতামূলক করতে হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক সংস্কার করা গেলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে আলোকিত মানুষ তৈরির কারখানা, খুলবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সব জানালা। যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হয়ে উঠবে তার সূতিকাগার।

শরীফুজ্জামান: শিক্ষক, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : বিশ্ববিদ্যালয়